Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501081 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Reflections of Rebellion, Egalitarianism, and Secularism in the Poems of Kazi Nazrul Islam
কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় প্রতিফলিত বিদ্রোহ, সাম্যবাদ ও অসাম্প্রদায়িকতা

Kuntal Bhattacharya
Independent Researcher
Raniganj

Received on: 29th April 2026
Accepted on: 09th May 2026

Abstract:
The emergence of Kazi Nazrul Islam in Bengali literature marks a significant and transformative phase. His varied life experiences profoundly shaped his literary voice, infusing his works with intensity, dynamism, and enduring relevance. Although primarily recognized as a poet, his contribution to Bengali poetry remains both substantial and distinctive. A central feature of Nazrul's poetry is its powerful articulation of rebellion, intertwined with ideals of equality, humanism, and secularism. He vehemently opposed injustice, oppression, and exploitation in all forms. His identity as the "Rebel Poet" extends beyond political defiance, encompassing resistance to social, religious, and psychological constraints. In his works, rebellion functions not merely as a destructive force but as a constructive impulse aimed at establishing truth, justice and renewal. Nazrul's humanistic vision reject divisions based on caste, religion, and class, affirming humanity as the ultimate identity. His poetry emphasizes compassion, inner truth and unity, while challenging rigid religious orthodoxy, thereby reflecting a deeply secular outlook. Within the socio-political context of colonial India, where communal divisions hindered collective resistance, Nazrul consistently advocated unity and harmony. His poetry thus operates both as artistic expression and as a vehicle of social awakening and political consciousness. Nazrul's literary legacy transcends the label of rebellion, emerging as a timeless symbol of equality, justice and human unity.

Key Words:
Rebellion; Humanism; Equality; Secularism; Social Justice; Anti-Colonial Resistance; Communal Harmony; Bengali Literature.

© Santiniketan Sahityapath

মূল প্রবন্ধ

বাংলা কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথের পর নজরুল ইসলামই সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চা যে পথে, তিনি সেই পথ অনুসরণ না করে ভিন্ন সুরে গান গাইলেন। কারণ তিনি যে সময় কবিতা লেখা শুরু করেছেন, সেই সময়কালের ঘটনাবলি তাঁর কাব্যের মুখ্যবিষয় হয়ে উঠেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ঊনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি রেজিমেন্টের সৈনিক নজরুল বাংলা কাব্যজগতে প্রবেশ করে তাঁর কবিতার উপাদান সংগ্রহ করলেন তাঁর নিজস্ব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে, সমকালের সমাজজীবন থেকে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত উপাদান তাঁর কবিতাকে সমকালের কবিদের কাব্যধারা থেকে ব্যতিক্রম ও স্বতন্ত্র স্থান দিল।

নজরুলের কবিতার মূলে রয়েছে সমসাময়িকতা। দেশ যখন ব্রিটিশ শাসনে পরাধীন তখন তিনি দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে নিয়ে কবিতা রচনার মাধ্যমেই দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করলেন। বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। তাই তাঁর কবিতায় যেমন বিদ্রোহী সত্তা ফুটে উঠেছে, তেমনি তাঁর প্রেমিক মন প্রেমের জয়গানেও উন্মুখ। সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, আর্থিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনি তাঁর কবিতায় মানবতার জয়গান ও সাম্যবাদী চেতনাও প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন সত্তার সংমিশ্রণ তাঁর কাব্যে ঘটেছে, এবং এতো বিচিত্র হয়ে উঠেছে যে তাঁর কাব্য সমকালীনতার সীমারেখায় আবদ্ধ না থেকে চিরকালীন হয়ে উঠেছে। তাঁর কাব্য পাঠের মধ্য দিয়ে তাঁর বিদ্রোহী, সাম্যবাদী, মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক সত্তার পরিচয় নেব।

বিদ্রোহী চেতনা: নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা সহজাত। এবং সেই সত্তার প্রকাশ ঘটার মতো আয়োজন করে দিয়েছিল সমকালীন সমাজ। তাঁর এই বিদ্রোহ অন্যায়ের, শোষণের, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তাঁর 'অগ্নিবীণা', 'বিষের-বাঁশি', 'সর্বহারা', 'ফণি-মনসা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে সেই বিদ্রোহের সুরই ধ্বনিত হয়েছে। নজরুলের একাধিক কবিতায় ও গানে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিদ্রোহী সত্তাই তাঁর কবিত্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য। ঔপনিবেশিক শাসন, সামাজিক বৈষম্য, ধর্মীয় ভেদাভেদ, কুসংস্কার ও ঘৃণার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় তাঁর বিদ্রোহী মননের পরিচয় সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট। যখন তিনি বলেন —

"বল বীর-
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর —
বল 'মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!"[১]

তখন ব্যক্তি মানুষের সর্ব বন্ধনমুক্ত নির্ভীক চেতনার প্রকাশ পায়। সেই চেতনার জাগরণে উন্নত শির দেখে হিমাদ্রীও মাথা নত করে। সেই উন্নত মস্তিষ্ক বিশ্ব, মহাকাশ, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা ও খোদার আসন ছাড়িয়ে যায়। সেই চেতনা, সেই আত্ম জাগরণ কোনো সামাজিক বন্ধন, নিয়ম কানুন শৃঙ্খল আইন মানে না, ভেদাভেদ, গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতাকে মুছে ফেলতে চায়। সমস্ত বাধা, সমস্ত শাসনকে উপেক্ষা করতে ভয় পায় না। সে স্বাধীন হতে চায়। মনের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে শত্রুর সঙ্গে গলাগলি আর মৃত্যুর সঙ্গে পঞ্জা ধরতেও ভয় করে না। বরং সেই নির্ভীক সত্তার ক্রুদ্ধ রোষের ভয়েই সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ কেঁপে কেঁপে নিভে যায়। সেই সত্তা জাহান্নামের আগুনে বসেও পুষ্পের হাসি হাসতে পারে। বিষ্ণু-বক্ষ থেকে যুগল কন্যা ছিনিয়ে আনতে পারে, কবি তাঁর অন্তরস্থিত সেই

© Santiniketan Sahityapath

সত্তার পরিচয় পেয়েছেন, আর তাই তিনি ঘোষণা করেছেন, "আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!" এই আত্মজাগরণ শুধু বাহ্যিক শাসনের বিরুদ্ধে নয়, বরং অভ্যন্তরীণ দাসত্ব, ভীতি ও নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধেও এক তীব্র চ্যালেঞ্জ। ফলে তাঁর বিদ্রোহকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের কাঠামোয় সীমাবদ্ধ রাখা যায় না; এটি এক ধরনের অস্তিত্ববাদী মুক্তির প্রকল্প হিসেবেও গ্রহণযোগ্য।

জগদীশ্বরের মধ্যে যে সত্তা বর্তমান, অন্যায়ের প্রতিবিধানে কবি সেই ঈশ্বরের শক্তি ও সত্তার অনুভব করেছেন নিজের মনে। এই অধীন বিশ্বকে নব সৃষ্টির মহানন্দে উপড়ে ফেলতে চান। তিনি সেইদিন শান্ত হবেন, "যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা,/ অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না", বিদ্রোহী ভৃগুর মতো খেয়ালী বিধির বক্ষে পদচিহ্ন এঁকে দেবেন। এ প্রসঙ্গে কবির উক্তি প্রণিধানযোগ্য —

"আপনাকে চেন। বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ যদি করতে পার, প্রলয় যদি আনতে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই, কল্যাণ আসবেই। লাথির মত লাথি যদি মারতে পার, তবে ভগবানও তা বুকে করে রাখে। ভৃগুর মত বিদ্রোহী হও, ভগবানও তোমার পায়ের ধুলো নেবে। কাউকে মেনো না, কোনো ভয়ে ভীত হয়ো না বিদ্রোহী। ছুটাও অশ্ব, চালাও রথ, হানো অগ্নিবাণ, বাজাও দামামা দুন্দুভি।... বল, আমিই নতুন করে জগৎ সৃষ্টি করব।"[২]

আলোচ্য কবিতাটিতে বিভিন্ন বৈপরীত্যের সহাবস্থান ঘটিয়েছেন কবি। তাই বিদ্রোহের প্রকাশ যেমন ঘটেছে তেমনি বিধবার ক্রন্দন, হা-হুতাশ, পথবাসী গৃহহারা পথিকের বেদনা, অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ মনের কাতরতা, সুনিবিড় ব্যথা, গোপন-প্রিয়ার চকিত চাওয়া, চপল মেয়ের ভালবাসা অনুভব তিনি করেছেন, সেখানে তাঁর মানব-দরদী মনের ও প্রেমিক সত্তার প্রকাশ পেয়েছে। সেই সমস্ত বিষয়ই 'বিদ্রোহী' কবিতার পটভূমি রূপে কাজ করেছে।

১৯২২ সালের ৬ জানুআরি সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে প্রথম প্রকাশিত নজরুলের এই 'বিদ্রোহী' কবিতাটি বাংলা কবিতার ইতিহাসে এবং নজরুলের কাব্যজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়, যেখানে রবীন্দ্র কাব্যবলয় থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন পথের দিশার খোঁজ করতে দেখা গেল এই প্রথম কোনো কবিকে, তেমনি এই কবিতার মাধ্যমেই নজরুল নিজের পথকে চিনে নিলেন ও আবিষ্কার করলেন নিজের শক্তি এবং সম্ভাবনাকে।

কবি 'বিদ্রোহী' কবিতায় বললেন, অধীন বিশ্বকে নব সৃষ্টির আনন্দে উপড়ে ফেলতে চান। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাতেও এই একই সুর ধ্বনিত হয়েছে —

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? — প্রলয় নূতন সৃজন- বেদন।
আসছে নবীন- জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন।"[৩]

নতুন সৃষ্টির জন্য যে সম্পূর্ণ বিনাশ প্রয়োজন সেই সম্পর্কে কবি অবহিত। তাই এই কবিতায় নতুনের জয়ধ্বনি করতে গিয়েও প্রলয়ের উল্লাসে মেতে উঠেছেন। নজরুলের এই ধারার কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিতেই নব সৃজনের জন্য প্রলয়ের আহ্বানের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। যদিও এর মধ্যে মিশে রয়েছে কবি হৃদয়ের তীব্র আবেগ, কিন্তু সেটি তাঁর স্বদেশ প্রেমের জন্যই। সেই স্বদেশ প্রেমের তীব্রতাই তাঁর বিদ্রোহী সত্তার মূল স্বরূপ। "আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ" এই চেতনা মনে উদয় হলে কোনো বাধা-বিপত্তি বিদ্রোহের গতিকে রুদ্ধ করতে পারেনা। কবিও তাই সেই চেতনায় উপনীত হয়েই সমাজের অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে লিখেছেন এমন কবিতা যা নিদ্রিত জনগণকে যেমন জাগ্রত করেছে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে, তেমনি সদাশঙ্কিত পরস্বাপহারী, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারকেও ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে তাঁর কবিতাগুলি। আর তাই 'আনন্দময়ীর আগমনে'এর মতো কবিতা, যেখানে কবি দেবী আনন্দময়ীকে আহ্বান জানিয়েছেন দেশে সংঘটিত চরম অরাজকতা ও অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য, "দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,/ ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী।"[৪] সিরাজ, টিপু সুলতান, মির কাশিম, ঝাঁসির

© Santiniketan Sahityapath

রানি এদের প্রাণ কি বৃথায় বলি গেল? কবিতার মধ্যে স্বাধীনতার চরম আকাঙ্ক্ষা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার বক্তব্য, এবং দেবীর দানবদলনী রূপে আহ্বান, সিরাজ, টিপু, মিরকাশিম, ঝাঁসির রানি প্রমুখের ইংরেজ শাসকদের রাজ্যবিস্তারের বিরুদ্ধে বলিদান — এই সবের উল্লেখ প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শাসককেও চমকে দিতে পারে, এবং সেটিকে বাজেয়াপ্ত করতে হয়। একই সঙ্গে রাজদ্রোহের অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হয় কবিকে। কিন্তু তাতেও কবির বিদ্রোহী সত্তাকে দমিত করা যায় না, "কারার ওই লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কর রে লোপাট" এর মতো গান তিনি রচনা করতে পারেন, বলতে পারেন কারাগারের তালা লাথি মেরে ভেঙে বন্দিশালাগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার কথা। এ শুধু তাঁর আবেগ নয়, এই বিদ্রোহী সত্তা ছিল তাঁর সহজাত। তাই তাঁর প্রায় সব কবিতাতেই এই বিদ্রোহ, প্রতিবাদের বীরত্বের বজ্রনাদ ধ্বনিত হয়। এ ছাড়াও 'রক্তাম্বর-ধারিণী-মা', 'আগমনী', 'ধূমকেতু', 'রণ-ভেরী' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে সেই বিদ্রোহের সুরই ধ্বনিত হয়েছে।

"অগ্নিবীণা'র কবিতাগুলির কবিমনের জটিলতার অপেক্ষাকৃত সহজ, স্পষ্ট ও সংহত রূপ প্রকাশ পেয়েছে 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থে। যদিও প্রায় প্রতিটি কবিতার ওপরেই 'গান' উল্লেখ করা আছে এবং গানের আকারেই লেখা। কিন্তু একে গান বা কবিতা যাই বলা হোক প্রতিটি রচনার প্রেক্ষাপটে সমসয়ায়িক ঘটনাবলীর ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। তূর্য-নিনাদ, বোধন, উদ্বোধন, অভয়-মন্ত্র, আত্ম-শক্তি, মরণ-বরণ, বন্দী-বন্দনা, মুক্তি-সেবকের গান, শিকল পরার গান, মুক্তি-বন্দী প্রভৃতি গান যেমন ইংরেজ সরকারের কারাগারে বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে লিখিত, তেমনি 'চরকার গান'এ গান্ধীবাদী চিন্তাধারার প্রকাশ পেয়েছে। আবার 'বিদ্রোহীর বাণী' কবিতায় তৎকালীন সুবিধাবাদী নেতৃবৃন্দ, ও স্বরাজীদের ভীরু ও দ্বিচারি মনোভাবকে লক্ষ্য করে ক্রুদ্ধ কবি গর্জে উঠেছেন —

"বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস্ স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্চে দরাজ তাই!
'ভারত হবে ভারতবাসীর'— এই কথাটাও বলতে ভয়!
সেই বুড়োদের বলিস নেতা- তাদের কথায় চলতে হয়!
বল রে তোরা বল নবীন-
চাইনে এসব জ্ঞান-প্রবীণ!
স্ব-স্বরূপে দেশকে ক্লীব করছে এরা দিনকে দিন,
চায় না এরা- হই স্বাধীন!" [৫]

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আর সুদিনের স্বপ্ন দেখানো নেতাদের তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। কবি চেয়েছেন দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। নেতাদের ব্রিটিশ রাজশক্তির ছত্রছায়ায় দেশ চালনাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। প্রবীণ নেতাদের ধর্ম কথা ও প্রেমের বাণী প্রচার মহান হলেও, সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়লে তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। হিংসার সামনে অহিংসার কথা শুনতে ভালো লাগলেও, বাঘকে কখনো হিংসা ছাড়িয়ে বেদান্ত পড়ানো যাবেনা। বাঘের নখ আর দাঁত থাকতে প্রেম-সেবক হওয়া বৃথা। যারা দেশকে প্রতিবাদ ভুলিয়ে, আপন অধিকার আদায় ভুলিয়ে অহিংসার বাণী ছড়ায় তারা দেশকে প্রকারান্তরে ক্লীবত্বের দিকে নিয়ে যায়। 'চরকার গান'এ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গান্ধিবাদি চিন্তাধারার প্রতি আস্থা, আর একই কাব্যগ্রন্থের 'বিদ্রোহীর বাণী' কবিতায় দেখি গান্ধিজীর অহিংস আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন তাঁকে হতাশ করেছে। কবি উপলব্ধি করেছেন চরকার সুতো কেটে স্বাধীনতা আসবে না। 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থের 'সব্যসাচী' কবিতায় সেই উপলব্ধিই প্রকাশ পেয়েছে —

"জাগো রে জোয়ান! ঘুমায়ো না ভুয়ো শান্তির বাণী শুনি-
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই,
দানব-দৈত্য তবু মরে নাই,
সূতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুণি!
জাগো রে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি'!" [৬]

কিন্তু কবি প্রত্যক্ষ করেছেন দেশবাসীর চরম দুর্দশা। স্বরাজের জন্য দরিদ্র নিরন্নেরাও চাঁদা হিসেবে ক্ষুধাতুর শিশুর আহার এনে দেয়, কোটি কোটি টাকা চাঁদা ওঠে, কিন্তু সেই স্বরাজ অধরাই থেকে যায়। কবি তাই স্পষ্ট জানতে চান আদৌ তারা দেশের স্বাধীনতা নিয়ে ব্যগ্র? তারা কি আদৌ স্বরাজ এনে দিতে পারবে? 'বিদ্রোহীর বাণী' কবিতার শেষে কবি নিজেই বললেন —

"যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করব সেথায় বিদ্রোহ!
ধামা-ধরা! জামা-ধরা! মরণ-ভীতু! চুপ রহো!
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ!
এই দুলালুম বিজয়-নিশান, মরতে আছি- মরব শেষ।"[৭]

কবির বিদ্রোহ মিথ্যা ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, ধামা-ধরা, জামা-ধরা, মরণ ভীতুদের বিরুদ্ধে। কবির 'সোজা কথা' দেশকে পূর্ণ স্বাধীন করা। তাতে যদি প্রাণ দিতে হয় তাতেও তিনি রাজি। তাঁর 'আমার কৈফিয়ত' কবিতাটি তাঁর স্বহস্তে লিখিত জীবনী। সেই কবিতায় তিনি বলেছেন দেশবাসীর চরম দুর্দশা দেখে শুনে তিনি ব্যাথিত, তিনি একা যেহেতু সেই বর্বর রাজশক্তির রক্ত ঝরাতে পারবেন না, তাই তিনি এই রক্ত লেখা লিখছেন। যা সকলকে উদ্বুদ্ধ করবে সেই ঔপনিবেশিক শক্তিকে বিতাড়িত করে দেশকে স্বাধীনতা এনে দিতে।

'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থের 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী' কবিতাতেও নজরুলের স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। এই কবিতায় তিনি আন্দামান দ্বীপে বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা তুলে ধরেছেন। একই সঙ্গে ইংরেজ শাসনের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন; যেখানে সত্য কথা বললে বন্দী হতে হয়, অত্যাচারিত হয়েও সেটিকে অত্যাচার বলতে পারা যায় না। সেই সবের বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে।

নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা তাঁর স্বদেশ প্রেমেরই নামান্তর। সেই তীব্র স্বদেশ প্রেম বশত তিনি যে কবিতাগুলি লিখেছেন, তাতে তাঁর বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর বিদ্রোহের প্রকাশ শুধু ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধেই নয়, দেশের সমস্ত কুপ্রথা, ভেদাভেদ, ক্ষমতালোভীদের চক্রান্ত, দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচার, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধেই। তাঁর এই বিদ্রোহ মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার বিদ্রোহ। স্বাধীনতার প্রবল স্পৃহা, পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যে তাঁর কত তীব্র ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কবিতাগুলিতে।

সাম্যবাদী ও মানবতাবাদ: নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তাধারার মূল ভিত্তিই হলো মানবপ্রেম। মানুষের প্রতি গভীর প্রেম বশতই তিনি মানুষের মধ্যে কোনো রকমের ভেদাভেদ মানতে পারেন নি। তিনি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অবস্থান অনুভব করেছেন বলেই মানুষকে অবমাননা করা মানে যে মানুষের অন্তরে অবস্থানকারী ঈশ্বরকেও অবমাননা করা এই ত্রিকাল সত্য কথাটি যা সমস্ত ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের সার কথা এটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। তাই 'মানুষ' কবিতায় তিনি বললেন, "মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান", মূলত এই চিন্তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাম্যবাদী চিন্তাধারায়। এবং সে ক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি যতো নিপীড়িত, শোষিত, অবহেলিত, নিরন্ন, বঞ্চিত, সর্বহারা মানুষদের পক্ষ নিয়েই কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার মাধ্যমে তিনি পীড়ক, শাসক, ধনবান ব্যক্তিদের সঙ্গে তৈরি হওয়া বিভেদকে মুছে দিতে চেয়েছেন। তিনি নিজেও ব্যক্তি জীবনে ভেদাভেদ ও বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। একই সঙ্গে অনুভব করেছেন সমাজ ও দেশের বঞ্চিত শোষিত অবহেলিত মানুষদের জীবন যন্ত্রণা। দেশ যখন পর পদানত সেখানে দেশবাসীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিভেদ ও বিদ্বেষকে মেনে নিতে পারেন নি। মূলত, ধর্মীয় বিভেদ, আর্থিক বৈষম্য, লিঙ্গগত বিভেদ, জাতিগত বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সেই সময়ে কার্যকরী ছিল। তাই তাঁর এই পর্বের কবিতাগুলিতে শোষিত, অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষদের হয়ে দরদী প্রতিবাদের সুর শোনা যায়। সমাজে প্রচলিত সনাতন রীতি-নীতির প্রতি মানুষের যে বিশ্বাস কবি সেইখানে আঘাত হেনেছেন। একই সঙ্গে, প্রচলিত মন্ত্র-তন্ত্র সহযোগে, আচার-সর্বস্ব সাধনমার্গের পরিবর্তে মানুষের মনের শাশ্বত চেতনাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'সাম্যবাদী' কবিতার প্রথমেই তিনি বলেছেন —

"গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলিম-ক্রিশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!"[৮]

এই কবিতায় তিনি ধর্মীয় ভেদাভেদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় সম্প্রীতির কথা তুলে ধরেছেন। সাম্যের মন্ত্রে সকলকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। এই সাম্যবাদী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে সমস্ত মানুষই এক, কোনো ব্যবধান সেখানে নেই। কারণ এ ধর্মীয় বিভেদ, এতো ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম গ্রন্থ এ সব তো মানুষেরই সৃষ্টি। তাই মানুষের সৃষ্ট ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ নিয়ে ভেদাভেদ করে কি হবে? কোরান পুরান বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক পড়া মানে পণ্ডশ্রম। যদি কোনো গ্রন্থ বা মতবাদ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাহলে সেই গ্রন্থপাঠ করে লাভ নেই। মানুষের হৃদয়েই সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান। কবিতায় সেই কথাই তিনি বলেছেন —

"তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখো নিজ প্রাণ!
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।"[৯]

নিজের মনের মধ্যে উঁকি দিলেই ঈশ্বরের অবস্থান অনুভূত হবে। মনের মন্দিরে তিনি অহরহ জাগ্রত সর্বদা বিরাজমান। মানুষ সেইখানে তাঁকে না খুঁজে, খোঁজ করে 'মৃত পুঁথি-কঙ্কালে'। মানব হৃদয়ই মন্দির, মসজিদ ও গির্জা, এই মানব হৃদয়ই নীলাচল, কাশী, মথুরা বৃন্দাবন, বুদ্ধগয়া, জেরুজালেম, মদিনা, কাবা। কবি তাই কবিতার শেষে বলেছেন, "এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই!"

তাঁর 'ঈশ্বর' কবিতায়ও এই একই ভাব প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মগ্রন্থ যেখানে বিভিন্ন ভেদাভেদের কথা বলে, জাত-পাত, বর্ণ বৈষম্যের কথা বলে — সেই সমস্ত বিষয়কে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিচালিত করে শাস্ত্রবিদেরা। যারা শাস্ত্রকে হাতিয়ার করে মানুষের অধিকারকে পদদলিত করে, সামাজিক মর্যাদার পথকে অবরুদ্ধ করে, তাদেরকে ভয় পেয়ে তাদের ধর্মীয় অনুশাসনকে মানতে হয় সাধারণ মানুষকে। কিন্তু সেই শাস্ত্রবিদেরাই কি ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছে? যে ঈশ্বরের প্রকাশ সকলের মাঝে, সেইখানেই তাঁকে খুঁজতে হবে। নিজের মধ্যেই ঈশ্বরকে চেনা যায়। জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে নিজের শরীরেই ঈশ্বরের ছায়াকে দেখা যায়। শাস্ত্রবিদেরা ঈশ্বরের 'প্রাইভেট সেক্রেটারি' নয়, তারা কখনো ঈশ্বরের সন্ধান পায়নি। কবি তাই শাস্ত্রবিদদের রত্নবণিক বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন —

"রত্ন লইয়া বেচা-কেনা করে বণিক সিন্ধু-কূলে-
রত্নাকরের খবর তা বলে পুছো না ওদের ভুলে।
উহারা রত্ন-বেনে,
রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে।"[১০]

তাই তাদের ভয় না পেয়ে, আকাশ-পাতাল, বন-জঙ্গল, পাহাড়ে না খুঁজে ফিরে আর শাস্ত্র না ঘেঁটে নিজেকে চিনতে বলেছেন কবি। তাঁর 'মানুষ' কবিতাটিতে তাঁর সাম্যবাদী চিন্তার ও মানবতাবাদী সত্তার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। কবিতার প্রথমেই তিনি ঘোষণা করেছেন —

"গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি!"[১১]

© Santiniketan Sahityapath

এই কবিতায় কবির বক্তব্য আমাদের মনে করিয়ে দেয়, পদাবলির চণ্ডীদাসের সেই কথাটি, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" কবিও সবকিছুর উপর মানুষকেই রেখেছেন। মানুষই সত্য। যার মধ্যে কোনো দেশ কাল পাত্র ধর্ম ও জাতির ভেদ নেই। তার মতো পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। কিন্তু ধর্মের ধ্বজাধারী মোল্লা পুরোহিতরা সেই মানুষকেই অবমাননা করে। আসলে তাদের ধর্মের মধ্যে আচারের আড়ম্বর যতখানি, ততখানি তাদের বিচার নয়, দয়া মায়া করুণা নয়। তাই তাদের মন্দির ও মসজিদের দরজা থেকে সাত দিনের অভুক্ত ভিখারীকে ফিরে যেতে হয়। মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়, আর মসজিদে নামাজ না পড়ার জন্য ক্ষুধার অন্ন জোটে না। মসজিদ আর মন্দিরে প্রভু নেই, "মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।"[১২] তাই নজরুল ক্রুদ্ধ হয়ে স্মরণ করেছেন চেঙ্গিস, গজনী মামুদ ও কালাপাহাড়কে। তারা যেন এসে ওই তালা দেওয়া ভজনালয়ের দ্বারগুলি ভেঙে দেয়। কবি আক্ষেপ করে বলেছেন, "হায় রে ভজনালয়,/ তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়!"[১৩] যারা মানুষকে ঘৃণা করে এবং কোরান, বেদ, বাইবেল নিয়েই কাল ব্যয় করে তাদের থেকে সেই গ্রন্থগুলি কবি জোর করে কেড়ে নিতে বলেছেন। এবং তাতেও যাদের জ্ঞান হয়না সেই মানুষদের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন, "মূর্খরা সব শোনো,/ মানুষে এনেছে গ্রন্থ; — গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো!"[১৪] মানুষ হয়ে মানুষকে দলিত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর। প্রতিটি মানুষই আদম দাউদ ঈশা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবিরেরই সন্তান, জ্ঞাতি। এই পিতা-পিতামহদেরই রক্ত আমাদের ধমনিতে কম বেশি চালিত হয়। মানুষকে অপমান করা মানে তো তাঁদেরও অপমান করা। তাই কবি বলেছেন —

> "হয়ত আমাতে আসিছে কল্কি, তোমাতে মেহেদি ঈসা,
> কে জানে কাহার অন্ত ও আদি, কে পায় কাহার দিশা?
> কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি?
> হয়তো উহারই বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাতি!"[১৫]

কিন্তু সে যদি তাও না হয়, মহান বা উচ্চ নয়, ক্ষত-বিক্ষত ও দুঃখী, তবুও জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ও ভজনালয় রয়েছে তারাও ওই ক্লেদাক্ত, খত-বিক্ষত ও দুঃখীর দেহের মতো পবিত্র নয়। চণ্ডাল দেখে যাদের ঘৃণার উদ্রেক হয় কবি তাদের সতর্ক করে বলেছেন, "ওই হতে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।"[১৬] রাখালকে দেখে যারা হেলা করে সেই হেলা কাকে বাজে? যদি রাখাল বেশে ব্রজের গোপাল এসে থাকে? যে ভিখারী ও ভিখারিনীকে দ্বারে নিত্য গালি খেয়ে ফিরে যেতে হয়, তাদের বেশে যদি কোনোদিন ভোলানাথ ও গিরিজায়া এসে থাকেন? নিজের ভোগের হ্রাস হবার চিন্তায় যারা এক মুষ্টি ভিক্ষা না দিয়ে ভিখারিরূপী দেবতাকে তাড়িয়ে দেয়। লোভ আর স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না, তারা দেখতেও পায়না তাদেরই সেবা করতে দেবতা কুলির বেশ ধারণ করেছেন। মানুষের এই লোভ, স্বার্থ ও কামনাই মানুষকে মৃত্যু বিবরে পতিত করেছে।

'পাপ' কবিতাটির মধ্যে নজরুল বিশ্বের সকল পাপীদের ভাই-বোন বলে সম্বোধন করেছেন। বিশ্বে এমন কেউ নেই যে কোনোও পাপ করেনি। তেত্রিশ কোটি দেবতার পাপে স্বর্গও টলমল করছে, সেখানে মানুষের আর এমন কি পাপ। মানুষকে যে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন সেই কাণ্ডারীও পাপে পঙ্কিল। এই বিশ্বকেই তিনি 'পাপস্থান' আখ্যা দিয়ে বলেছেন — "অর্ধেক এর ভগবান, আর অর্ধেক শয়তান!"[১৭] এবং ধর্মান্ধদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা — "অন্যের পাপ গণিবার আগে নিজেদের পাপ গোনো!"[১৮]

'বারাঙ্গনা' কবিতায় কবি বারাঙ্গানাদের প্রতি তাঁর যেমন দরদী সমবেদনা জানালেন, তেমনি তাদের 'মাতা ভগিনীর জাতি' বলে সম্বোধন করে তাদের সামাজিক মর্যাদার পক্ষে সওয়াল করলেন। ঘৃতাচী, সত্যবতী, কুন্তী, গঙ্গা, জবালা, অহল্যা, মেরী প্রমুখ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নারীদের এবং তাঁদের বীর ও স্মরণীয় পুত্রদের কথা তুলে ধরেছেন। নজরুলের কবিতার ওপর একটা অভিযোগ প্রায়শ উঠে থাকে তাঁর কবিতা নাকি আবেগ সর্বস্ব, ভাবের গভীরতা নেই। কিন্তু ভাবের গভীরতা যদি না থাকত তাহলে কবি বারাঙ্গানাদের সামাজিক মর্যাদার পক্ষে দাঁড়িয়ে যে কবিতাটি লিখেছেন যার জন্য তাঁকে মোহিতলালের মতো কবির থেকেও বিদ্রূপ ও আক্রমণ পেতে হয়েছে, সেই কবিতায় তিনি যে প্রশ্নগুলি করেছেন, দেড়শত পৃথিবীর অধিবাসীর মধ্যে কয়জন পিতামাতা

নিষ্কাম ব্রতী হয়ে পুত্র-কন্যা কামনা করেছে? কয়জন তপস্যা করেছে সন্তান লাভের জন্য? কার পাপে কোটি দুখের শিশু আঁতুড়ে জন্মেই মারা যায়? এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র পশুর ক্ষুধা নিয়েই নরনারী মিলিত হয়। তাই সবাই সেই কামনার সন্তান। বারাঙ্গনাদের সন্তানদের যারা জারজ বলে গালি দেয়, তাদের সঙ্গো কামনার সন্তান 'কামজ'দের কোনো প্রভেদ খুঁজে পাননি কবি। বারাঙ্গনাদের অসতী বলে যে ঘৃণা করা হয়, তাহলে বহু নারীর প্রতি আসক্ত পুরুষরাই অসৎ হবে না কেন? কবি তাই বলেছেন, "অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ-পুত্র হয়,/ অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়!"[১৯] অবশ্যই এর মধ্যে আবেগের প্রাবল্য রয়েছে। কিন্তু সেই প্রবল আবেগের উৎপত্তি ভাবের গভীরতা থেকে।

তাঁর 'নারী' কবিতাটিতে নারীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ব্যক্ত করেছেন। এই কবিতায় তাঁর নারীবাদী ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। একই সঙ্গো নারীমুক্তির জন্য তাঁকে সচেষ্ট দেখা যায়। তাঁর মধ্যে বিদ্রোহী সত্তার, সাম্য ও অসাম্প্রদায়িক সত্তার, মানবতাবাদের যেমন উপস্থিতি দেখতে পাই, তেমনি তাঁর মধ্যে প্রেমিক সত্তাও বর্তমান। তিনি অজস্র প্রেমের কবিতা ও গান রচনা করেছেন। সেখানে তাঁর সৌন্দর্য ভাবনা ও প্রেমের-বিরহের-মিলনের পরিচয় পাওয়া যাবে। কিন্তু 'নারী' কবিতাটিতে নারীদের প্রতি বঞ্চনা, অন্যায় ও নারীদের সংগ্রামকেই তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদ করেন নি। কারণ তিনি জানেন বিশ্বের সমস্ত চির কল্যাণকর মহৎ সৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ উভয়েরই যৌথ অবদান রয়েছে। কিন্তু সমাজে নারীদের অবস্থানকে পুরুষের নিচেই রাখা হয়েছে। যা তাদের উত্থানের পথকে রোধ করেছে। কবি তাই বলেছেন —

"সে-যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাকো, নারীরা আছিল দাসী!
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি,
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে!"[২০]

কবি তাঁর সমকাল এবং পরবর্তী কাল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি সেই ভবিষ্যতের কল্পনা করেছেন, যেখানে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। মানুষ পরিচিতি পাবে মানুষ হিসেবেই। এবং সমকালের নারীদের প্রত্যক্ষ করে বুঝেছেন তাদের নিজেদের প্রকাশের জন্য সেই ব্যাকুলতা নেই। তারা পুরুষের অত্যাচারে ও অধীনেই অভ্যস্ত। নারীদের দাসী বানিয়ে রেখেছে যে ঘোমটার শেকল; কবি এই দাসত্বের চিহ্নকে দূর করে দিতে বলেছেন। তিনি অনুভব করেছেন আগত সেই নব যুগকে, যেদিন এই পৃথিবী পুরুষের সঙ্গো নারীরও জয়গান গাইবে।

'কুলি-মজুর' কবিতায় কবি সামাজিক শ্রেণি বৈষম্যের প্রতি সোচ্চার হয়েছেন। একদিকে ধনী, শাসক, বলবান, বুর্জোয়া ও আত্মসর্বস্ব সম্প্রদায় অন্যদিকে শোষিত শ্রমজীবী সর্বহারা মানুষ। যে শ্রমজীবী সর্বহারা রেল, মোটর, জাহাজ, কল-কারখানা, অট্টালিকা সমস্ত কিছুর পরিচালনে ও নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যে কুলিরা শাসক ধনী বাবুসাহেবদের সেবা করতে নিজের পবিত্র অঙ্গো ধূলি লাগায়, তারা শ্রমের পরিবর্তে তাদের ন্যায্য বেতন লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের ঠেলে রেল থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হয়। পারিশ্রমিক চাইলে অত্যাচার ও অপমান সহ্য করতে হয়। কিন্তু নবযুগ আসন্ন, এই কুলি মজুর শ্রমিকদের নীচে দলিত করে রাখার পরও তেতলায় শয়নকারী বাবুসাহেবদের দেবতা বলে সম্বোধন করতে হবে, সেই দিন আর নেই। আজ একজনকে ব্যথা দিলে, সেই ব্যথা সকলের বুকে সমান হয়ে বাজে, একজনকে অসম্মান করলে তা নিখিল মানব জাতির লজ্জা — সকলের অপমান। কারণ, "মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,/ ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নিচে কাঁপিতেছে শয়তান!"[২১]

তাঁর 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ফরিয়াদ' কবিতাটিতেও সাম্যবাদী দর্শনের প্রভাব রয়েছে। অন্যান্য কবিতার মতো এখানেও তিনি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ভগবানের সৃষ্ট এই পৃথিবীতে তাঁর কৃপা ও করুণা সর্বক্ষেত্রেই সমান ভাবে বিরাজমান।

© Santiniketan Sahityapath

এবং এই পৃথিবীর যাবতীয় সকল বস্তু ও বিষয়ে সকলের সমান অধিকার; তা একা কারোও জন্য নয়। শ্বেত কালো পীত যে বর্ণেরই মানুষ হোক না কেন তাঁরই তো সৃষ্টি। কালো বলে তা তো অপরাধ নয়। কিন্তু পৃথিবীতে সেটাই হচ্ছে; তাই কবি তা অনুভব করে বলেছেন — "সাদা র'বে সবাকার টুটি টিপে, এ নহে তব বিধান।"[২২] এই ভাবে তো তারা ভগবানেরই অসম্মান করছে। ভগবানের বিধান যা, তার বিপরীত ক্রিয়া জগতে চলছে। যারা জনগণকে প্রতিনিয়ত জোঁকের মতো শোষণ করে তারাই মহাজন অথচ যারা সেই জমিকে সন্তানের মতো পালন করে তারা জমিদার নয়। কবি তাই ফরিয়াদ করেছেন এতো অন্যায় কেন ভগবান সহ্য করছেন। তিনি মহীয়ান তিনি সহ্য করতে পারবেন। কিন্তু পীড়িত মানুষ এ অপমান আর সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু এখন দিকে দিকে নিপীড়িত মানুষ জেগে উঠেছে। মরিয়া হয়েই আজ তাদের মুখে "মার মার" ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে। যারা চির-অবনত তারা আজ মুক্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠছে —

"জয় নিপীড়িত প্রাণ!
জয় নব অভিযান!
জয় নব উত্থান!"[২৩]

কবিতাটির মধ্যে সমস্ত রকমের অত্যাচার, অসঙ্গতি ও অন্যায়ের প্রতিবিধানে কবির ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন দিনের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন, যেখানে নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের অভ্যুত্থানে প্রতিষ্ঠিত হবে সকলের সমান অধিকার, ন্যায়ের শাসন, স্বাধীনতা ও মৈত্রী।

নজরুলের সাম্যবাদী চেতনা তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারাও প্রভাবিত। প্রথম দিকে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাস রাখলেও ক্রমেই নজরুল কংগ্রেসের প্রতি হতাশ হন। রানিগঞ্জের শিহারসোল রাজ স্কুলে পড়ার সময় তিনি তাঁর শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটক যিনি বিপ্লবী যুগান্তর পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হন।[২৪] তাই রাজনীতি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন ছাত্রাবস্থা থেকেই। এবং বিপ্লবী ধ্যানধারণার সূত্রপাতও তখন থেকেই। সেই বিপ্লবী চেতনাই তাঁর কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল। অসহযোগ আন্দোলন ও ১৯২৫ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন দাশের আপোষমূলক অবস্থানে হতাশ হয়ে নজরুল সেখান থেকে সরে আসেন। গান্ধির প্রতিও তাঁর মোহভঙ্গ হয়। এরপর নজরুল ও তাঁর কয়েকজন বামপন্থী বন্ধুরা মিলে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন যার নাম লেবার স্বরাজ পার্টি, যে দলটি কংগ্রেসের ভেতরেই একটি উপদল হিসেবে কাজ করত। এবং এই দলের মুখপত্রের নাম ঠিক করা হয় 'লাঙল'। পত্রিকার প্রধান পরিচালক নজরুল ইসলাম। এই 'লাঙল' সাপ্তাহিক পত্রিকার নামের নিচেই লেখা ছিল 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের মুখপত্র'। এবং এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার 'সর্ব্ব প্রধান সম্পদ' নজরুলের সাম্যবাদী কবিতা। কিন্তু তাই বলে এই কবিতাগুলিকে রাজনৈতিক দলের ইস্তেহার ভেবে নেবার কোনো কারণ নেই। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের ও সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রতিফলন অবশ্যই ঘটেছে, কিন্তু তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই এই কবিতাগুলি লিখেছেন — এমনটা বলা ভুল হবে, "অবশ্যই এ কবিতা এক রোম্যান্টিক বিপ্লবী কবির বক্তব্য-প্রধান কবিতা, সূক্ষ্ম ভাব-প্রধান কবিতা নয়। কিন্তু কবির ভাবাবেগের প্রচণ্ডতা পাঠকের অন্তরকে প্রবলভাবে আলোড়িত না-করে পারে না।"[২৫] এর আগে 'ধূমকেতু' পত্রিকার সময়ে "তিনি ছিলেন মনে মনে রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের সমর্থক, বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী। তাঁর তখনকার রচনাবলির লক্ষ্য এবং আবেদন ছিলো শহরের তরুণ মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অপর পক্ষে, লাঙলের পাঠকদের শ্রেণি যা-ই হোক, অন্তত তাঁর লক্ষ্য ছিল কৃষক-শ্রমিক-সহ সমাজের নীচের তলার মানুষ।"[২৬] মূলত মুজফফর আহমেদ-সহ কয়েকজন তাঁর বামপন্থী বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। নিজেও বামপন্থী চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর একাধিক কবিতায় 'লাল ফৌজ'এর উল্লেখ রয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির 'ইন্টারন্যাশনাল' সংগীত বাংলা ভাষায় তিনি অনুবাদও করেছিলেন নিজের মতো করে 'অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত' নাম দিয়ে, যেটি 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে প্রচলিত রাজনৈতিক মতাদর্শের বাইরে এক স্বতন্ত্র মানবতাবাদী চিন্তকের অবস্থানে স্থাপন করে।

অসাম্প্রদায়িকতা: নজরুলের সাম্যবাদ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাই তিনি প্রথাগত ধর্মের পরিবর্তে হৃদয় ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু নজরুলের সেই সময়কাল ধর্মীয় সমন্বয়ের অনুকূল ছিল না। ইংরেজ এবং তার বিভাজন ও শাসন নীতি, ধর্ম নিরপেক্ষ কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুসলিম লিগের উত্থান, দেশে ছোটোখাটো ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে অসম্মতি ও ঝামেলা ও তার

 © Santiniketan Sahityapath

সঙ্গো ধর্মীয় ভেদাভেদ ভারত তথা বাংলার ধর্মীয় সম্প্রীতিকে বিঘ্নিত করছিল। ২ এপ্রিল ১৯২৬ কলকাতায় হিন্দুদের রাজরাজেশ্বরী মিছিলকে কেন্দ্র করে এক পূর্ব পরিকল্পিত হিন্দু ও মুসলমানের দাঙ্গাও হতে দেখা যায়।[২৭] এ ধরনের খণ্ড যুদ্ধ প্রায়ই লেগে থাকত। কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে বৃহত্তম ঐক্যের প্রয়োজন তা নজরুল অনুভব করেছিলেন। আর অনুভব করেছিলেন বলেই তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য একাধিক কবিতা লিখেছেন। 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাতেও সেই বার্তাই তিনি দিয়েছেন —

"অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ!
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!"[২৮]

আসল কথা হলো নজরুল নিজে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাই তাঁকে যোগ সাধনা, শ্যামা বা শক্তিপূজায় যেমন সক্রিয় দেখা যায়, তেমনি আল্লা বা খোদার প্রতিও তাঁর আস্থা ছিল অসুস্থতার আগে পর্যন্ত। তিনি জন্মগত ভাবে মুসলিম হলেও বিবাহ করেন প্রমিলা সেনগুপ্তকে। তাঁর পুত্রদের নাম দেন কৃষ্ণ মহম্মদ, কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ। তাঁর সাহিত্য তাঁরই জীবনকাহিনী, "সাম্যবাদী চেতনা নজরুলকে অসাম্প্রদায়িক করেছিল যদিও এই অসাম্প্রদায়িকতা তিনি জন্মসুত্রে পেয়েছিলেন — তাঁর পিতা সর্বধর্মাবলম্বী লোকের প্রিয় ছিলেন। কুরআন, হাদীশ পুরাণ গীতা রামায়ণ মহাভারতের লোকায়ত ব্যাখ্যান লেটো দলে ভিড়ে গিয়ে পেয়েছিলেন এবং সেখান থেকেই একটা উদারনৈতিক মানবতাবোধ তিনি অর্জন করেছিলেন।"[২৯] তাঁর কবিতার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। বলা চলে তাঁর কবিতাও তাঁরই মতো অসাম্প্রদায়িক। গানের ক্ষেত্রেও তিনি যেমন শ্যামাসঙ্গীত রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তেমনি ইসলামি গানেও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তিনি হিন্দু ও মুসলিমের মিলন সাধনে ছিলেন তৎপর।

তিনি মানুষকে যেহেতু মানুষ হিসেবেই দেখে এসেছেন তাই তাঁর কাছে কোনোদিনই মানুষের ধর্ম ও জাতিগত পরিচয় বড়ো হয়ে দাঁড়ায়নি, তা আমরা তাঁর সাম্যবাদী ও মানবতাবাদী চেতনার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জেনেছি। জাতিভেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এই সমস্যাটিকে চিহ্নিত করে তিনি 'জাতের বজ্জাতি' কবিতায় বলেছেন জাত ছেলের হাতের মোয়া নয়, যে ছুঁলেই জাত চলে যাবে। যারা হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়িকেই জাতের প্রাণ মনে করেছে তারাই এক জাতিকে একশো ভাগে ভাগ করেছে। এই জাত ধর্ম হলো বর্মের মতো সহনশীল, তাকে কখনোই ছোঁয়াছুঁয়ির একটা ছোটো ঢিল ভেঙে ফেলতে পারে না। তিনি কবি হয়েও এই ভেদাভেদের শিকার হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী হিন্দু হওয়ায় তিনি অনেক হিন্দুর ও মুসলমানের চক্ষুশূল হন। আবার কবিতায় হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ করায় (বিশেষ করে তিনি যখন বিদ্রোহী কবিতায় 'খোদার আসন আরশ ছেদিয়া' এবং 'ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন!' লিখেছিলেন তখন থেকেই মুসলিম কবিরা তাঁকে ভালো নজরে দেখতেন না, এবং 'ইসলাম-দর্শন' পত্রিকায় তাঁকে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় আক্রমণ করা হয়, যা শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়[৩০]) অনেক মুসলিমেরও রোষানলে পড়েন। সেই ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেছেন 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় —

"মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল্-লা'রা কন হাত নেড়ে,
'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে!
ফতয়া দিলাম-কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও!
'আমপারা'— পড়া হামবড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে!'
হিন্দুরা ভাবে, 'পার্শি-শব্দে কবিতা লেখে, ও পা'ত নেড়ে!"[৩১]

এসব বিষয় তিনি নিজে অনুভব করেছিলেন। এই ভেদাভেদের বীভৎস ও কুৎসিত রূপ তাঁর সাহিত্যে তাই এত প্রাণবন্ত ও তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজে ঘটিত এই সমস্ত ভেদাভেদ ও অসাম্যকে মুছে দিতে তিনি সচেষ্ট হন। তাই তিনি বলতে পারেন — "মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।/ মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।।" হিন্দু-মুসলিমের বিভেদ ও দাঙ্গা সেই যুগের

© Santiniketan Sahityapath

সামাজিক সম্প্রীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছিল। নজরুল হিন্দু-মুসলমানের মিলনসাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। এ প্রসঙ্গে কবির উক্তি — "হিন্দু- মুসলমানে দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনের একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা পাষাণস্তূপের মতো জমা হয়ে আছে — এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে, অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম — অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম — আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর"[৩২]

কাজী নজরুল ইসলাম এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন ভারতবর্ষ ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই পরাধীনতার অপমান, বেদনা ও অসহায়তা তাঁর মননে গভীর ছাপ ফেলেছিল। ফলে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁর সৃষ্টিশীলতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তিনি কলমকে কেবল সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং প্রতিরোধের শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তাই তাঁর কবিতায় প্রতিবাদ, আবেগ এবং গতিশীলতার এক অনন্য সম্মিলন দেখা যায়।

নজরুল মূলত সমাজসচেতন কবি। সমাজের অবিচার, বৈষম্য, শোষণ ও মানবিক সংকট তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে প্রবল তীব্রতায়। তবে তাঁর কবিতাকে কেবল রাজনৈতিক বা মতাদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এর প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করা যায় না। তাঁর কাব্যের প্রাণ নিহিত রয়েছে ভাষার সজীবতা, সুরমাধুর্য এবং আবেগের শক্তিশালী প্রবাহে। এই আবেগ নিছক ব্যক্তিগত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং তা সমষ্টিগত মানবঅভিজ্ঞতার এক শিল্পিত রূপ।

নজরুলের কবিসত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বৈপরীত্যের সৃজনশীল সমন্বয়। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'তে যেমন ধ্বংস ও সৃষ্টির, কোমলতা ও কঠোরতার, প্রেম ও প্রতিবাদের শক্তি একসঙ্গে মিলিত হয়েছে, তেমনি তাঁর অন্যান্য রচনাতেও এই দ্বান্দ্বিকতা লক্ষণীয়। এই দ্বান্দ্বিকতা বা পরস্পরবিরোধী উপাদানগুলির সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই তিনি মানবমুক্তির এক সার্বজনীন কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন, যা সময়ের সীমা অতিক্রম করে আজও সমান প্রাসঙ্গিক। সুতরাং, নজরুলের কবিতাকে কেবল একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দলিল হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়। তাঁর সাহিত্য এক জীবন্ত মানবদর্শনের বহিঃপ্রকাশ, যা চেতনায় প্রশ্ন তোলে, চিত্তের জাগরণ ঘটায় এবং ন্যায় ও স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর কাব্য আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রকৃত সাহিত্য কেবল নান্দনিক আনন্দ নয়, বরং তা মানবচেতনার জাগরণ, ন্যায়বোধের প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তির পথ অনুসন্ধানের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস।

Prantik Gabeshana Patrika

তথ্যসূত্র:

১। 'অগ্নি-বীণা', কাজী নজরুল ইসলাম, ডি. এম, লাইব্রেরি, কলকাতা, ৩৮ মুদ্রণ জুন ২০১৩, পৃ. ১২
২। 'নজরুল ইসলাম কবিমানস ও কবিতা', ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, রত্নাবলী, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ বইমেলা, জানুআরি, ২০১৬, পৃ. ৯৪
৩। 'অগ্নি-বীণা', কাজী নজরুল ইসলাম, ডি. এম, লাইব্রেরি, কলকাতা, ৩৮ মুদ্রণ জুন, ২০১৩, পৃ. ১১
৪। 'নজরুল-রচনাবলী' ৯ম খণ্ড, কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) অক্টোবর ২০১৫, পৃ. ২০
৫। 'বিষের-বাঁশি', কাজী নজরুল ইসলাম, ডি. এম, লাইব্রেরি, কলকাতা, নবম সংস্করণ জানুআরি, ২০০৯, পৃ. ৬৩
৬। 'নজরুল-রচনাবলী' ২য় খণ্ড, কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) মে ২০১১, পৃ. ৩০
৭। 'বিষের-বাঁশি', কাজী নজরুল ইসলাম, ডি. এম, লাইব্রেরি, কলকাতা, নবম সংস্করণ জানুআরি, ২০০৯, পৃ. ৬৫
৮। 'নজরুল-রচনাবলী' ২য় খণ্ড, কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) মে ২০১১, পৃ. ৭৯
৯। ওই, পৃ. ৭৯
১০। ওই, পৃ. ৮০
১১। ওই, পৃ. ৮১
১২। ওই, পৃ. ৮১

© Santiniketan Sahityapath

১৩। ওই, পৃ. ৮২
১৪। ওই, পৃ. ৮২
১৫। ওই, পৃ. ৮২
১৬। ওই, পৃ. ৮২
১৭। ওই, পৃ. ৮৪
১৮। ওই, পৃ. ৮৪
১৯। ওই, পৃ. ৮৮
২০। ওই, পৃ. ৯০
২১। তদেব পৃ. ৯৫
২২। ওই, পৃ. ১২৪
২৩। ওই, পৃ. ১২৭
২৪। 'কাজী নজরুল ইসলাম', বসুধা চক্রবর্তী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, নয়া দিল্লি ১৩, জানুআরি ১৯৬০, পৃ. ২
২৫। 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত নজরুল জীবনী', গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ২২৬
২৬। ওই
২৭। ওই, পৃ. ২৩৩
২৮। 'নজরুল-রচনাবলী' ২য় খণ্ড, কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) মে ২০১১, পৃ. ১২২
২৯। 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল', আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ জানুআরি, ২০১৬, পৃ. ৫৪৮
৩০। 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত নজরুল জীবনী', গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ১২৯
৩১। 'নজরুল-রচনাবলী' ২য় খণ্ড, কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ): মে ২০১১, পৃ. ১২৮
৩২। 'নজরুল-রচনাবলী' ৮ম খণ্ড, কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) ফেব্রুআরি ২০১৮, পৃ. ৪৭

সহায়ক গ্রন্থতালিকা:

১। মুজাফফর আহমদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষোড়শ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর, ২০১৫
২। নজরুল ইসলাম, 'অগ্নি-বীণা', ডি. এম, লাইব্রেরি, কলকাতা, ৩৮ মুদ্রণ জুন, ২০১৩
৩। কাজী নজরুল ইসলাম, 'নজরুল-রচনাবলী' ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) মে ২০১১
৪। কাজী নজরুল ইসলাম, 'নজরুল-রচনাবলী', ৮ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) ফেব্রুআরি, ২০১৮
৫। কাজী নজরুল ইসলাম, 'নজরুল-রচনাবলী', ৯ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ, প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) অক্টোবর, ২০১৫
৬। কাজী নজরুল ইসলাম, 'বিষের-বাঁশি', ডি. এম, লাইব্রেরি, কলকাতা, নবম সংস্করণ জানুআরি, ২০০৯
৭। বসুধা চক্রবর্তী, 'কাজী নজরুল ইসলাম', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, নয়া দিল্লি ১৩, জানুআরি, ১৯৬০
৮। আজহারউদ্দীন খান, 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল', সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ জানুআরি, ২০১৬
৯। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা কবিতার কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ জানুআরি, ২০১৮

 © Santiniketan Sahityapath

১০। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাস’, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, নবম সংস্করণ সেপ্টেম্বর, ২০১৫

১১। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘নজরুল ইসলাম কবিমানস ও কবিতা’, রত্নাবলী, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ বইমেলা জানুআরি, ২০১৬

১২। গোলাম মুরশিদ, ‘বিদ্রোহী রণক্লান্ত নজরুল জীবনী’, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ ডিসেম্বর, ২০১৮

পত্রপত্রিকা:

১। পশ্চিমবঙ্গা, নজরুল সংখ্যা, তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গা সরকার, কলকাতা, ২৬ মে, ১৯৭৮

—

© Santiniketan Sahityapath